বাঁধানো ঘাট ছাড়াও টিলা থেকে একটা সিঁড়ি সাপের মতোই এঁকে-বেঁকে নেমে গেছে ছোট্ট পুকুরে। সিঁড়িটা ওপরের দিকে একটা চাঁপাগাছ–বসন্ত এলেই চাঁপা ফুলে ভরে যায় গোটা সিঁড়ি, তখন মনে হয় হলুদবসন্ত নেমেছে।

হরিপ্রসাদ মিত্র নাকি তখনই ভেবেছিলেন–টিলার ওপরে একটা ছোট্ট মন্দির করা হবে। যাতে ছেলে সবাইকে নিয়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে জল-বাতাসা নিবেদন করতে পারে সময়ে-সময়ে। পূঁজা ঘরটা শেষ হওয়ার আগেই শরৎ এসে যায়–অর্ধনির্মিত ছোট্ট মন্দিরেই সেবারের পারিবারিক পুঁজো দিয়েছিলেন হরিপ্রসাদের বাবা, কিন্তু লক্ষী পূঁজার পরপরই তাকে ভগবান নিজের কাছে নিয়ে গেছেন বলে বাহারি টালির পুঁজোঘরটা অনেক পর হলেও হরিপ্রসাদই শেষ করেছেন–মেজেতে বিছানো হয়েছে দামি পাথর। সেই থেকেই মিত্র বাড়িতে নিয়মিতই পূঁজা হয়। শহরের আত্মীয় ছাড়াও নানা রকমের মানুষ আসে, আসে মিরসরাই থেকে অনেকে, যারা অনেকদিন ধরে নানাভাবে মিত্রদের সঙ্গে যুক্ত আছে; সাহেব-সুবারাও আসেন। এই শহরে এই রকম তিনবিঘের বাড়ি হয়তো আছে, কিন্তু ছোট্ট পুকুর আর গাছগাছালিতে ভরা অরণ্যানী ভাব, সকালে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে, সন্ধ্যায় হরেক পক্ষীর কিচিরমিচির ডাক–এরকম বাড়ি মেলা ভার। পাখির ডাক শুনতে অনেক পক্ষীপ্রেমিকের দেখা মেলে মিত্রবাড়িতে। কেউ আবার চলে আসতো বড়শি হাতে মিত্রদের পুকুরে–যারা নদী কিংবা বড় দিঘিতে সাহস করতো না; পুকুরের মৎস্য শিকার নাকি মিত্রবাড়িতে তারা নানানপদে আপ্যায়িত হতে অধিক আগ্রহী ছিলো তা নিয়ে কেউ কখনো ভাবেনি।

হরিপ্রসাদের চলে যাওয়ার পর খুব বেশিদিন থাকেননি দেবেন মিত্রদের মা। ততদিনেও ছোট মেয়ের বিয়ে হয়নি। ছোট মেয়ের বিয়েটা দেখে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করার চেয়ে স্বামী হরিপ্রসাদ মিত্রের সঙ্গে স্বর্গে গিয়ে একসঙ্গে থাকাটাই তিনি শ্রেয় ভাবলেন, নাকি বিধাতাই সেটি ঘটিয়ে দিলেন সে-কথা বলা কিংবা অনুমান করা কঠিন।

হরিপ্রসাদের মৃত্যুর কিছু আগেই দেবেনের সরকারি কলেজে চাকরি জুটেছিলো। বাবাই বিয়ে দিয়ে গেছেন–পাত্রী শহরেরই আরেক মিত্রদের কন্যা, বিএ করে শহরের একটা স্কুলে মাস্টারি করতেন। অবশ্য মায়ের মৃত্যুর আরও বেশ পরে গোলমাল হয়ে গেলো। দেবেনের মেজোটা বাবার রেখে যাওয়া ব্যবসাটা দেখতে শুরু করে। মায়ের চলে যাওয়ার পর বড়'দাই ভাইকে বিয়ে দেয়–আর বিপত্তি এখানেই। হিন্দু পরিবারে ভাইদের একহাঁড়িতে অন্নগ্রহণ–শিক্ষক দেবেন মিত্রর কাছে এক ধরনের গর্বের ব্যাপার মনে হলেও সেটায় ধস নামায় তারই মেজো ভাই। প্রথমে স্বর্গীয় ঠাকুরদার দ্বিতল বাড়িতে তিন ভাই মিলে থাকলেও মেজো ভাই ততদিনে ব্যবসার পুরো দায় নিয়ে নিয়েছিলেন; এ-ব্যাপারে বড় ভাইয়ের বিশেষ আপত্তিও ছিলো না। ফলে বছর তিনেকের মধ্যে মিত্র বাড়ির ত্রি-সীমানায় আরও একটি ঘর উঠে যায়। মেজো ভাইয়ের সঙ্গে অন্নভাগের সময়ে ছোটোটাকেও আলাদা হতে বলেছিলেন দেবেন মিত্র, সেটা অনেকটা রাগবশতই। কিন্তু ছোট রাজি হয়নি। সেই একই কথা তার–আমি বাবার পর তোমাকেই বুঝি দাদা। সেই অবধি ছোটটা বড়দার সঙ্গেই আছে। আরও ক'বছর পর যথারীতি ছোটবোনের বিয়ে দেন দেবেন মিত্র। আর ছোট ভাই দাদার গর্ব হিন্দু পরিবারের একহাঁড়ি ধরে রেখে চলেছে সেই থেকে।

দেবেন মিত্র পদার্থবিদ্যার শিক্ষক হলেও সাহিত্যপাঠ তার প্রাত্যহিক ব্যাপার–সকালে ক্যাসেটে বাজে রবীন্দ্র সঙ্গীত, টেবিলে দেখা মেলে হরেক অভিধান আর ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের বই। স্ত্রীর অসুস্থকালেই তিনি বাংলা নাম পছন্দ করে রেখেছেন, সেটা আবার স্ত্রীকে বলেন না, কী জানি সারপ্রাইজ দেয়ার মানসেই হয়তো। প্রথম সন্তানের নাম রাখেন তিনি ঋদ্ধ, মানে দেবতা বিশেষ কিংবা মেধাবী। স্ত্রী সুলেখা মিত্র জানতে চান–কোন অর্থ দেখে এই নাম রেখেছো। দু'টোই–সাফ জবাব দেবেন মিত্রের। ঋদ্ধর জন্মের আগে যে-ছুটি নিয়েছিলেন সুলেখা সেটি আরও দীর্ঘ হয়ে যায় এবং স্কুলের চাকরিটাও ছেড়ে দেন সুলেখা মিত্র–ততদিনে দেবেন মিত্র চট্টগ্রাম শহরে পদার্থ বিদ্যার দামি শিক্ষক বলে খ্যাতি পেয়ে গেছেন; ফলে ছেলে-মেয়েদের পড়াতেও ব্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। প্রথম দুর্যোগটি তখনই আসে–সাড়ে পাঁচমাসের মাথায় ঋদ্ধ মিত্র কঠিন নিউমোনিয়ায় ইহলোক ত্যাগ করে। হয়তো শোক কাটাতেই কিনা বোঝা যায় না–দেড়বছরের মাথায় মেয়ের জনক-জননী হন দেবেন ও সুলেখা। তারও বছরদেড়েক পর ঋভুর দেখা। ঋতির পর এবারও দেবেন মিত্র ছেলের নামায়ণে সেই ঋ-এর দিকেই ঝুঁকলেন।

– হয়েছে কী তোমার, সবার নামই কেনো ঋ দিয়ে শুরু, আর কোনও নাম নেই কি!

স্ত্রী সুলেখার এমন প্রশ্নের জবাবে কিছুক্ষণ নীরব থাকলেও একটা সময়ে তাকে বলতে হয়–এ শব্দগুলোর অর্থ জানো, আর শুনতেও তো অনেক ভালো লাগে।

– বুঝলাম। ঋদ্ধর অর্থও অসাধারণ, কিন্তু..।

– দ্যাখো, ভগবানের ওপর কারও কি হাত আছে!